Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 338 – 345
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

কাল্পনিক খনপালা ও মাধাই মহন্তের আধুনিকতা

ফণিভূষণ মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
সেন্ট জোসেফ'স কলেজ, নর্থ পয়েন্ট, দার্জিলিং
ইমেইল : mondalphanibhuson@gmail.com

Keyword
লোকনাট্য খনপালা, খনপালার ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, খনপালার বিষয় ও আঙ্গিক, কাল্পনিক খনপালা, মাধাই মহন্ত, খনপালার আধুনিকতা।

Abstract
খনপালা বা খনগান লোকনাট্যের ধারায় একটি ঐতিহ্যলালিত পালাগান— যা মূলত অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চলে অধিক প্রচলিত ছিল। কিন্তু দেশভাগ উত্তর পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুরে (১৯৯২ সালের পর থেকে বর্তমানে যা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর নামে পরিচিত) খন পালাগানের ঐতিহ্য সমানভাবে বাহিত হয়েছিল লোকসংস্কৃতির আঙ্গিনায়, যে-কারণে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাকে 'খনের দেশ' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। লোকসংস্কৃতির তাত্ত্বিক, গবেষক বা পাঠকের কাছে তা অজানা নয়; তাই গোড়াতেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে— 'কাল্পনিক খন' কী এবং তা কার হাত ধরে গড়ে উঠেছিল? দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খনপালাকার এবং খনপালার পরিচালক ও অভিনেতা মাধাই মহন্তের (পিতৃদত্ত নাম ছিল মাধাই রায়) হাত ধরেই 'কাল্পনিক খন' গড়ে উঠেছিল। আমার অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য বিষয় হল কীভাবে মাধাই মহন্ত প্রচলিত খনপালার বিষয় ও আঙ্গিককে ব্যবহার করে একদিকে সমকালীন সমস্যাকে নিয়ে খনপালা রচনা ও অভিনয় করেছিলেন অন্যদিকে নিত্য নতুন আবিষ্কৃত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে নিয়ে 'কাল্পনিক খন'-এর সৃষ্টি করেছিলেন— যা একই সাথে আধুনিকতার প্রবল দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন?

Discussion
মাধাই মহন্তের মৃত্যুর পর তাঁরই কোনও এক ঘনিষ্ঠ শিষ্য গুরুর উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখেছিলেন—

"হামার গঁসাই মহন্ত মাধাই আকাশের তারা। /তাহার তনে মনটো হামার দুখে দিশাহারা।।"[১]

গত ১৫ মে ২০১৮ সালে (মতান্তরে ১৪ মে) তিনি পরলোক গমন করেন। কিন্তু কে এই মাধাই মহন্ত? দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার খনপালাকার এবং খনপালার পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবেই তাঁর পরিচয়। তাঁর জীবনের সঙ্গে দিনাজপুরের (প্রথমে পশ্চিম দিনাজপুর এবং পরে দক্ষিণ দিনাজপুর) লোকনাট্যের ঐতিহ্য খনপালা কীভাবে জড়িয়ে পড়েছিল এবং

কোন্ কোন্ দিক থেকে তিনি আধুনিক খনশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন? অন্যদিকে তাঁর হাত ধরে খনপালার নতুন একটি সংরূপ 'কাল্পনিক খন' কীভাবে গড়ে উঠেছিল এবং তা কতখানি আধুনিক হয়ে উঠেছিল— এই দুটি ভাবনাকে সামনে রেখে আমরা মাধাই মহন্তের জীবন ও খনচর্চা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করবো।

এক

খনশিল্পী মাধাই মহন্তকে কেন আমরা 'কাল্পনিক খন'-এর আধুনিক খনশিল্পী হিসেবে চিহ্নিত করবো? মাধাই মহন্তের জন্ম পয়লা জানুয়ারি ১৯২৯ সালে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার সুকদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেগারধরী গ্রামে। পিতা স্বর্গীয় হাউয়া রায় এবং মাতা স্বর্গীয়া ননীবালা রায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত বলা দরকার, পুত্র সন্তানের আশায় এবং আর্থিক অসঙ্গতি না থাকার কারণে হাউয়া রায় একের পর এক বিবাহ করেন— অবশেষে অষ্টম স্ত্রী ননীবালার গর্ভে জন্ম হয় মাধাই রায়ের। তার চার বছর বয়সে পিতার মৃত্যু ঘটে, কিন্তু অভাবের মধ্য দিয়ে তাঁকে কখনও বড়ো হতে হয়নি। বংশের একমাত্র উত্তরাধিকার হওয়ায় মা এবং ঠাকুরদার আদরে তাঁর ছোটোবেলা কাটে, কেউ কখনও তাঁকে শাসন করেনি। ফলে যা মন চায় তাই করতেন— যে কারণে স্কুল যেতে চাইতেন না, ফলে তাঁর আর পড়াশোনা হয়নি। শুধু নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পারতেন কোনোমতে— যদিও মাঝেমধ্যেই 'ধা' শব্দটি ছোটো বড়ো হয়ে যেত।[২] তা নিয়ে অবশ্য তাঁর কোনোদিন আক্ষেপ ছিল না। ভাবলে অবাক হতে হয়, যিনি লেখাপড়া জানতেন না, তিনি কীভাবে ছাপান্নটি (৫৬টি) খনপালা মুখে মুখে তৈরি করেছিলেন? পড়াশোনায় মন না থাকলেও মাধাই রায়ের জীবনের অন্য শিক্ষার হাতে খড়ি হয়েছিল ঠাকুরদার কোলে বসে কীর্তন, পাঁচালী কিংবা ভাওয়াইয়া গানের এবং রাতে মায়ের মুখে ঘুমপাড়ানি গান শুনে। শুধু গান শোনাই নয়, ঠাকুরদার কাছে একমনে তিনি শুনতেন রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, এমনকি খনার বচন পর্যন্ত। ঠাকুরদা ছাড়াও পাড়ার বয়স্ক যারা গান বাজনা করতেন তাদের বাড়িতে গিয়ে আপন মনে লোক আঙ্গিকের নানা গান শুনতেন তিনি। অন্যদিকে মা ননীবালা দেবীর নেশা ছিল গ্রামে কোথাও যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান বা খনগান হলে শুনতে যাওয়া এবং ছেলেকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। দিন যত গড়াতে লাগলো গান বাজনার প্রতি মাধাইয়ের ঝোঁক তত চেপে বসল। ছোটো থেকে অবাধ স্বাধীনতা মাধাইকে করে তুলেছিল বেপরোয়া— ফলে এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে তিনি তুক্ষ্যাগান, ভাটিয়ালি, কবিগান কিংবা বন্ধুয়ালা গান সবার অজান্তে আয়ত্ত করেছিলেন। প্রকৃতির খোলা আঙ্গিনায় হৃদয় ভরে গ্রহণ করেছিলেন তিনি লোকগানের বিচিত্র স্বাদ।

বারো বছর বয়সে তিনি গ্রামীণ এক যাত্রাদলে ঢুকে পড়েন এবং তাঁর দরাজ গানের গলায় মুগ্ধ হয়ে যাত্রাদলের ম্যানেজার তাঁকে *আসমানের ফুল* যাত্রাপালায় নর্তকী চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগও দেন।[৩] শোনা যায়, ওই বয়সে তিনি নর্তকী সেজে গান ও নৃত্য সহযোগে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন। মানুষের মুখে মুখে বারো বছর বয়সী মাধাইয়ের সুখ্যাতি গ্রামে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মায়ের কানেও খবর এসে পৌঁছায়, ছেলের সুখ্যাতির খবর পেয়ে তিনি মাধাইকে আর কখনও বাধা দেননি। মা ননীবালা রায়ের গ্রামীণ তথা লোকায়ত যাত্রাপালা, কবিগান এবং খনগানের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা প্রকারান্তরে ছেলে মাধাই রায়ের পরবর্তী জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাব করেছিল। সাংবাদিক সুনীল চন্দের ভাষ্য থেকে আমরা জানতে পারি মাধাই মহন্তের জীবনের বাঁক বদলের ঘটনা।[৪] মাধাই রায়ের বয়স তখন চোদ্দ বছর, মায়ের সঙ্গে একদিন খনপালা শুনতে যান নারায়ণপুর মৌজার পিরপাল গ্রামে। তার আগে তিনি যাত্রাপালা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবিগান শুনলেও, সারা রাত জেগে কখনও খনপালাগান দেখেননি। সেই প্রথম রাত জেগে দেখেন *বাংলা সোরী ইংলিশ বাউদিয়া* খনপালা। লোকনাট্যের এই বিশেষ ফর্ম— খনপালা তাঁকে ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট করে। কেননা, সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনাকে সংলাপে, গানে, নাচে এবং বাদ্যে লোকশিল্পীরা যেভাবে মাতিয়ে তুলেছিলেন খনপালাগানে— যা তাঁকে সেদিন খুব নাড়া দিয়েছিল। যার ফলে তিনি সিদ্ধান্ত নেন আর যাত্রাপালা নয়, যদি করতে হয় তবে তিনি খনপালাই করবেন। তাই তিনি যাত্রাদল ছেড়ে (যাত্রাদলের ম্যানেজারের অনেক অনুরোধ উপেক্ষা করে) যোগ দেন খনপালার দলে। দীর্ঘদিন তালিম নিয়ে মাধাই রায় তাঁর জীবনের প্রথম খনপালাগান *গুনাইবিবি*-তে গুনাই চরিত্রে অভিনয়

করেন। তারপর *রচি মন সুন্দরী, লায়লা মজনু* ইত্যাদি খনপালাগানে অভিনয় করে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেন এবং খনপালাগানের সু-অভিনেতা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

খনপালা নিয়ে মাধাইয়ের ভবঘুরে জীবন মায়ের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে, কেননা ছেলে জমি-জমার কিছুই বোঝে না। তাই তিনি গরীব বাড়ির করিৎকর্মা পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে শান্তিবালার সঙ্গে ছেলে মাধাইয়ের বিয়ে দেন, তাতে যদি সংসারে ছেলের মন ফেরে। কিন্তু বিয়ে করেও মাধাইয়ের মন সংসারে নেই, স্ত্রীকে একা রেখে রাতের পর রাত খনপালাগানে তিনি মেতে থাকেন। এদিকে স্বামীর খনপালা নিয়ে শান্তিবালার কোনো আগ্রহ ছিল না, আর তা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি দিনের পর দিন বাড়তেই থাকে। হঠাৎই একদিন ননীবালা রায় মারা যান, মাতৃ-বিয়োগেও মাধাই রায় সংসারমুখী হননি। বরং স্ত্রী শান্তিবালার সঙ্গে তাঁর দূরত্ব আরও বেড়ে যায়। জায়গা জমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনি কোনদিনই নেননি— এমনকি মায়ের মৃত্যুর পরেও না। অথচ স্ত্রী শান্তিবালা কোলের সন্তান মানিককে নিয়ে একা হাতে জমি-জমার কাজ সামলাতেন। সংসারের অশান্তি যখন তুঙ্গে তখন একদিন ভীষণ রাগে ও জেদে মাধাই রায় ঘর-বাড়ি, জমি-জমা, ছেলে-বউকে ছেড়ে বিবাগী হয়ে গৃহত্যাগ করেন।[৫] ঘুরে বেড়ান বাউলের নানা আখড়ায়, খনপালাগান ছেড়ে মেতে ওঠেন বাউল গান নিয়ে। তাঁর জীবনের আর এক পর্বান্তর— মাধাই রায় হয়ে উঠলেন গোঁসাই, পিতৃ পরিচয় ছেড়ে আত্ম-পরিচয় ধারন করলেন মাধাই মহন্ত হয়ে। তাঁর গানের দরাজ গলা ছিল, তাই তিনি বাউল গানের আসর মাতিয়ে তুললেন। নানা আখড়ায় ঘুরে বহু গুরুর সান্নিধ্যে আয়ত্ব করলেন বাউল তত্ত্ব— যা দেহতত্ত্ব নামে পরিচিত। আর দেহতত্ত্বের সাধনায় মেতে উঠলেন, জুটল সাধন সঙ্গিনী ভারতী। মাধাইয়ের বাউল গানে এতটাই মুগ্ধ হন বিবাহিতা ভারতী যে তিনি স্বামী-সংসার ছেড়ে সাধন সঙ্গিনী হয়ে ওঠেন মাধাইয়ের এবং পরে মাধাই মহন্ত তাঁকে বিবাহ করেন। বেশ কয়েক বছর তিনি ভারতীর সঙ্গেই ছিলেন এবং সেই সঙ্গে ছিল বাউল গানের আসর। বাউল তত্ত্ব নিয়ে মতবিরোধের কারণে কালিয়াগঞ্জের কোনো এক বাউলের আসর থেকে (মতান্তরে রায়গঞ্জ) প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মাধাই মহন্তকে বের করে দেওয়া হয়।[৬] সেদিনের ওই ঘটনার পর মনের দুঃখে মাধাই মহন্ত পুনরায় প্রত্যাবর্তন করেন খনপালাগানে।

বাউলের আখড়া থেকে বিতাড়িত হয়ে মাধাই মহন্ত ঠিক করেন তিনি নিজে দীক্ষা দেবেন। তিনি প্রথমে তাঁর কিছু অনুরাগীদের দীক্ষা দেন এবং বংশীহারী ব্লকের রাঘবনগরে নিজের আখড়া স্থাপন করেন। ধীরে ধীরে সেখানে তাঁর ভক্তকুল বাড়তে থাকেন। এই ভক্তদের মধ্যে এক বিধবা রমণী তাঁর দেখাশোনা করতে থাকেন এবং ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অবশেষে তিনি বিধবা বাসন্তী দেবীকে বিবাহ করেন এবং এক সাথে থাকতে শুরু করেন। জীবনের ঘটে যাওয়া নানা ঘটনাকে পেছনে ফেলে পুনরায় তিনি গভীর মনোনিবেশ করেন খনপালাগানে। নিজে লিখতে না জানলেও লেখাপড়া জানা ভক্তদের তিনি মুখে বলে বলে সমকালীন সমাজে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা ও কাহিনিকে নিয়ে একেরপর এক খনপালা রচনা ও অভিনয় করতে শুরু করেন। তাঁর আর একটি মস্ত সুবিধা ছিল যে, তিনি নিজেই গান বেঁধে সুর দিয়ে গাইতে পারতেন— যা তাঁর সহজাত প্রতিভা ছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই দূর-দূরান্তে খনশিল্পী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। খনপালার পাশাপাশি তিনি এখানে কবিরাজি বিদ্যার চর্চা শুরু করেন— তাঁর কোনো ভক্ত অসুস্থ হলে তিনি নিজের হাতে তৈরি করে কবিরাজি ওষুধ দিতেন এবং তারা সুস্থ হয়ে উঠতেন। যার ফলে তাঁর কবিরাজির প্রসার দিনকে দিন বাড়তে থাকে। কিন্তু উড়ে এসে জুড়ে বসা মাধাই মহন্তের কবিরাজির প্রসার রাঘবনগরের পুরাতন কবিরাজরা সু-নজরে নেননি। তাদের গভীর ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তে তাঁর দেওয়া কবিরাজি ওষুধ খেয়ে একজনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় রাঘবনগরে তাঁর নামে ছি ছি পড়ে যায়। তিনি গভীর ক্ষোভে এবং অপমানে রাঘবনগর পরিত্যাগ করেন। রাঘবনগর ছাড়লেও তিনি খনপালাগান ছাড়েননি, সোজা চলে আসেন গঙ্গারামপুর ব্লকের মালিপাড়া গ্রামে। কবিরাজি ছেড়ে তিনি মাধুকরী করে বেঁচে থাকার রসদ জোগাড় করতেন। আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর এতটাই ছিল যে, মালিপাড়া থেকে মাত্র এক-দুই কিলোমিটার দূরে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি, প্রথম স্ত্রী শান্তিবালা এবং একমাত্র পুত্র মানিক থাকা সত্ত্বেও তিনি কোনদিনই সে মুখো হননি।[৭] এককথার মানুষ মাধাই মহন্ত গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন, তাই ২০১৮ সালে ১৪ মে পঞ্চায়েত ভোটে ভোট দেন এবং পরে দিন ঊননব্বই বছর বয়সে সকাল এগারোটা নাগাদ মারা যান।

এতো গেল মাধাই মহন্তের সংক্ষিপ্ত জীবন-চর্যা— তিনি কীভাবে ছোটোবেলা থেকে পড়া ছেড়ে গানে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন এবং খনপালাগানের সঙ্গে নিজে কীভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। এখন আমরা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখাতে চাইবো যে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নিজস্ব লোক-ঐতিহ্য তথা লোকনাট্য খনপালাগানে মাধাই মহন্তের অবদান কতখানি? সেইসঙ্গে খনপালার প্রচলিত ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে মাধাই মহন্ত কীভাবে খনপালার নতুন সংরূপ 'কাল্পনিক খন'-এর জন্ম দিয়েছিলেন এবং সেই খনপালাকে কীভাবে এবং কতখানি আধুনিক করে তুলেছিলেন?

দুই

খন নিয়ে গবেষক ও তাত্ত্বিকেরা কী মতামত জানিয়েছেন এবং তা কতটা গ্রহণযোগ্য— গোড়াতেই বিশ্লেষণ করা দরকার। লোকসংস্কৃতির গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন, সংস্কৃত 'ক্ষণ' শব্দ থেকে 'খন' কথাটি এসেছে এবং 'খন গান তাৎক্ষণিকভাবে রচিত'।[৮] সংস্কৃত 'ক্ষণ' শব্দটি সময় বা কালকে বোঝায়, তাই 'খন গান তাৎক্ষণিকভাবে রচিত' কথাটিতে বিষয়ের একটিমাত্র দিক ধরা পড়ে— কীভাবে খনপালাগান পরিবেশনের সময় লোকশিল্পীরা তাৎক্ষণিকভাবে গান ও সংলাপ তৈরি করেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যে অন্য একটি দিক অস্পষ্ট থেকে যায়, সমাজে সদ্য ঘটা কোনো ঘটনাকে ঘিরে যে খনপালা তাৎক্ষণিকভাবে গড়ে ওঠে তা জনমানসে তখনও টাটকা— তাদের মুখে মুখে হয়তো সেই ঘটনার নিন্দা-মন্দ আলোচিত হচ্ছে। এই দিকটা মাথায় রেখে বলা যেতে পারে, সমাজে সদ্য ঘটে যাওয়া কোনো একটি নিন্দা-মন্দ ঘটনাকে নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত হয় খনপালা। অন্যদিকে নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতে, 'খন' কথাটি এসেছে সংস্কৃত 'খন্ড' থেকে, অর্থাৎ খন্ড > খন্ন > খন। তিনি 'খন্ড' বলতে এপিসোড বা খন্ড কাহিনিকে নির্দেশ করেছেন এবং সেই খন্ড কাহিনি থেকে খনের উদ্ভব বলে মনে করেছেন।[৯] তাঁর এই ভাষাতাত্ত্বিক বিবর্তন (খন্ড > খন্ন > খন) কষ্ট-কল্পনা বলে মনে হয়, কেননা 'খন্ড'-র সঙ্গে 'খন'-এর যোগসূত্র হিসেবে খন্ড কাহিনির যথাযথ ব্যাখ্যা আমরা পাই না। সাধারণত খনপালাগানে কোনো একটা কাহিনির খন্ড অংশ অভিনীত বা গাওয়া হয় না, বরং কাহিনির একটি সামগ্রিক প্রকাশ ঘটে।

আবার 'খন্ড' থেকে 'খন'— এই একই অভিমত লোকসংস্কৃতি গবেষক শিশির মজুমদারও করেছেন, যদিও তিনি 'খন্ড'-র সঙ্গে 'কান্ড'-র একটা সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, 'খন্ড' হল ঘটনা এবং 'কান্ড' শব্দটি সাধারণভাবে 'একটি নির্দিষ্ট কৌতূহলজনক ঘটনা বোঝাতে' ব্যবহৃত হয়, যাকে দেশী-পোলি-রাজবংশী ভাষাভাষির মানুষজন 'খন্ড' বলে। এইসূত্রে তিনি 'কান্ড'-র সঙ্গে 'খন্ড'-র একটা সংযোগ স্থাপন করে দেখিয়েছেন –

> "এই 'খন্ড' যখন গানে বাঁধা পড়ে, তখন তা 'খন'।"[১০]

অর্থাৎ খন্ড ঘটনার ভিত্তিতে রচিত গানের সমাহারই খন। তিনি খন্ড ঘটনা বলতে বুঝিয়েছেন—

> "জীবনের একটি খন্ড চিত্র এখানে (খনপালায়) ধরা পড়ে। ...এটা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, জীবনের খন্ড-অঙ্গ।"[১১]

এই বক্তব্য থেকে প্রশ্ন জাগে, শুধুমাত্র খনপালাতেই কী জীবনের খন্ড-চিত্র ধরা পড়ে, লোকনাট্যের অন্য শাখাগুলোতে বিশেষ করে গম্ভীরা, আলকাপ, পালাটিয়া, কুশানপালা কিংবা নটুয়া পালাতে কী জীবনের খন্ড-চিত্র প্রকাশ পায় না? অন্যদিকে লোকসংস্কৃতি গবেষক পুষ্পজিৎ রায় 'খন'-র সঙ্গে 'খনন' (অর্থাৎ খোঁড়াখুঁড়ি করা) শব্দের অর্থগত সম্পর্কের কথা বলেছেন।[১২] যদিও পরবর্তীকালে তিনি নিজেই তাঁর এই অভিমতকে 'কষ্ট কল্পনা' মনে করেছেন। কেননা, তিনি দীর্ঘদিন উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলার কুড়িটি অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে জেনেছেন খনের সঙ্গে 'খেত' ও 'ফসল' শব্দদুটি জড়িয়ে আছে। প্রথমে আমরা 'খেত' শব্দের সঙ্গে খনের সম্পর্ক নিয়ে দৃষ্টিপাত করবো। কলীন্দ্রনাথ বর্মণ রচিত *রাজবংশী অভিধান*-এ পাই— 'খন' শব্দটি জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 'খেত' অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১৩] অথচ সেই অঞ্চলে খনপালাগান অপ্রচলিত এবং অপরিচিতও বটে। ফলে 'খেত'-এর সঙ্গে খনের সম্পর্ক খোঁজা অনেকটা কষ্ট-কল্পনা নয় কি? অন্যদিকে 'ফসল'-র সঙ্গে খনের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন–

> "খনগান হচ্ছে উৎসবের গান, উৎসবকালের গান, অবসর-অবকাশ বা বিরামকালের গান।"[১৪]

কিন্তু 'উৎসবের গান' মানেই কী শুধু খনগানকে বুঝবো? উৎসবকালে যে পালাগানের আসর বসত সেখানে কী কেবল খনপালাগান পরিবেশিত হত, অন্য কোনো লোক-আঙ্গিকের লোকনাট্য পরিবেশিত হত না? সেইসঙ্গে তিনি 'আনন্দ উপভোগের জন্য' যে গান তাকে খনগান বলেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে— খনপালাগান ব্যতীত অন্যান্য যে লোকপালাগান পরিবেশিত হয় তা কি আনন্দ উপভোগের জন্য নয়? আবার যদি কোনো বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে (বন্যা অথবা খরা) ফসল নষ্ট হয়, তাহলে কী উৎসবকালটা কৃষকদের কাছে আনন্দমুখর থাকে? তখন কী খনগানকে 'উৎসবের গান', কিংবা 'আনন্দ উপভোগ'-এর জন্য গাওয়া গান বলা যাবে?

আমরা চারজন লোকসংস্কৃতি গবেষক ও তাত্ত্বিকদের অভিমতগুলি পর্যালোচনা করে খনের স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের যুক্তি সাপেক্ষে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন— তা যেমন একেবারে অস্বীকার করা যায় না, তেমনই আবার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে গিয়ে বেশ কিছু প্রশ্নও থেকে যায়। এঁদের পাশাপাশি খনপালাগানের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত খনশিল্পী মাধাই মহন্ত মনে করতেন 'খন' শব্দটি এসেছে 'খনা' থেকে, অর্থাৎ খনা > খন।[১৫] কেননা, কিংবদন্তী খনার বচন যেমন সত্য, তেমনই লোকায়ত জীবনের ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা নিয়েই বাঁধা হয় খনপালাগান। এই উপলব্ধির পাশাপাশি তিনি মনে করতেন—

> "খন মাটির গান, জীবনের গান। যে গানে সুর-তাল, রাগ-রাগিনীর বালাই নেই।"[১৬]

অর্থাৎ মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা অবলম্বনে খনপালাগান রচিত হয় এবং যে গানগুলি গাওয়া হয় তা লোকায়ত জীবনের প্রবহমান সুর-তালে, কোনো নির্দিষ্ট রাগ-রাগিনীতে বাঁধা পড়ে না। অন্যদিকে 'খন' কথার অর্থ বিশ্লেষণ করে মাধাই মহন্ত ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি জানান, 'খন' শব্দের মধ্যে দুটি অক্ষর আছে— 'খ' এবং 'ন'। 'খ'-এর অর্থ হল আকাশ, আবার ভিন্ন অর্থে তিনি 'খ' মানে 'খরা পুরুষ'-কে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন— তাই তিনি মনে করেছিলেন 'খ' এখানে পুংলিঙ্গ হিসেবে প্রযোজ্য। অন্যদিকে 'ন'-এর অর্থ হল 'নশ্বর', আবার ভিন্ন অর্থে 'ন' বলতে 'নারী' বা 'অন্ধ নারী'-কে বোঝাতে চেয়েছেন— তাই এখানে 'ন' তাঁর মতে স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে প্রযোজ্য। এর অতিরিক্ত তিনি আর বিস্তারিত কিছু জানাননি।[১৭] তিনি মনে করতেন মূলত তিন রকমের নারী নিয়ে খনপালা সৃষ্টি হয়। প্রচলিত খনপালার নামের শেষে 'শোরী' বা 'সোরী' যুক্ত থাকে নায়িকা বা নারী বোঝাতে, তাই তিনি বাংলা বর্ণমালার তিনটি বর্ণ— 'শ', 'ষ' এবং 'স' ব্যবহারের সাহায্যে তিন ধরনের নারীকে চিহ্নিত করেছেন। যথা— 'শ'-তে শিশু বা কুমারী নারী, 'ষ'-তে বিবাহিতা নারী এবং 'স'-তে বিধবা নারী বোঝাতে। খনপালা মূলত এই তিন প্রকার নারীকে ঘিরে রচিত হয় বলে মনে করতেন মাধাই মহন্ত।[১৮] প্রসঙ্গত, এই তিন প্রকার নারী তাঁর জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে স্ত্রী হিসেবে এসেছেন— কুমারী শান্তিবালা প্রথম স্ত্রী, বিবাহিতা ভারতী দ্বিতীয় স্ত্রী এবং বিধবা বাসন্তী তৃতীয় স্ত্রী। মাধাই মহন্ত নিজের জীবনাভিজ্ঞতা থেকেই কী তাঁর এই শিল্প-উপলব্ধির সত্যতায় পৌঁছেছিলেন?

খনপালাগানের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত খনশিল্পী মাধাই মহন্ত নিজের জীবন ও শিল্পীর অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি থেকে খন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করে দেখিয়েছি যে খন কি এবং তা নিয়ে লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট চারজন গবেষক ও তাত্ত্বিকদের নিজস্ব মতামত ও যুক্তি কেমন ছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন মত ও যুক্তিকে পাশাপাশি রেখে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারি যে, খনপালাগান হল লোকশিল্পকলার একটা বিশেষ শিল্পকলা বা আর্ট— যা একই সঙ্গে গান এবং পালা; কখনও শুধু খনগান গাওয়া হয়, আবার কখনও পালার আকারে গান সংলাপ নৃত্য বাদ্য ও অভিনয় সহকারে পরিবেশিত হয়। তাই আমরা শুধু খনগান বা খনপালা না বলে একত্রে খনপালাগান হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এবার আসা যাক, খন লোকশিল্পকলার একটি বিশেষ শিল্পকলা বা আর্ট কেন ? ফোক-আর্ট বা লোকশিল্পকলায় লোকায়ত জীবনের ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা বিভিন্ন আঙ্গিকে— কখনও সেটা গানের মধ্য দিয়ে, কখনও বা নাচের মধ্য দিয়ে, আবার কখনও বা পালা-অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শক সমাবিষ্ট আসরে পরিবেশিত বা পারফর্ম করা হয়। তাই লোকশিল্পকলার একটি বিশেষ শিল্পকলা হল খনপালাগান— যা প্রধানত গ্রামীণ লোকায়ত মানুষজনের দ্বারাই নির্মিত হয়, অভিনীত হয় এবং পরিবেশিত হয়।

তিন

খনপালাগানের প্রচলিত ধারা থেকে কাল্পনিক খনপালা কোথায় স্বতন্ত্র এবং তা কতখানি আধুনিক ? সাধারণভাবে খনপালা দুই ধরণের — শাস্তোরী বা শাস্ত্রীয় খনপালা এবং অ-শাস্তোরী বা অ-শাস্ত্রীয় খনপালা। খনপালার এই প্রকারভেদ নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো গবেষক দ্বিমত পোষণ করেননি। প্রচলিত ধারায় শাস্তোরী খনপালা মূলত যোগশাস্ত্র ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক, যথা — *বোষ্টম বাউদিয়া নয়ন শোরী*। বর্তমানে শাস্তোরী খনপালা পরিবেশিত হয় না, কারণ সম্পর্কে সাংবাদিক সুনীল চন্দ জানিয়েছেন-

> "শাস্তোরী খন এখন প্রায় অচল। লোকে এখন কিরচা অর্থাৎ কেচ্ছাটাই শুনতে চায়।"[১৯]

সময়োপযোগী না-হয়ে ওঠায় শাস্তোরী খন কী তবে বিলুপ্তির পথে? অন্যদিকে অ-শাস্তোরী খনপালা মূলত লোকজীবনে ঘটে যাওয়া কোনো কেচ্ছা-কাহিনি নিয়ে পরিবেশিত হয়, তাই একে দেশী-পোলি-রাজবংশীতে ঘিসা খন বা খিসা খনও বলা হয়। যেমন, *মিনতী সোরী পুলিশ মার্ডার* ঘিসা খনের উদাহরণ। প্রসঙ্গত বলা দরকার, খনপালার নামকরণে নায়ককে 'বাউদিয়া' ও নায়িকাকে 'শোরী' (শাস্তোরী খনে) বা 'সোরী' (অ-শাস্তোরী খনে) বলে উল্লেখ করা হয়। খনপালার এই প্রচলিত ধারণার বাইরে আমরা আর এক রকমের খনপালার প্রস্তাব রাখতে ইচ্ছুক, যাকে আমরা কাল্পনিক খনপালাগান হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই— যার স্রষ্টা ছিলেন মাধাই মহন্ত।

সহজাত প্রতিভায় তৎকালীন সময়ের নানা ঘটনাকে মাধাই মহন্ত তাঁর নিজস্ব কল্পনায় খনপালায় রূপায়িত করতে পারতেন খুব সহজেই। ১৯৬৮ সালে (১৩৭৫ বঙ্গাব্দে) তিনি *মিনতি সোরী পুলিশ মার্ডার* নামক একটি খনপালা রচনা, অভিনয় ও পরিচালনা করেন— পালাটির খ্যাতি এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে, তখনকার দিনে সাধারণ দর্শক টিকিট কেটে পালাটা দেখত। আর এই পালাটির জন্য মাধাই মহন্তকে দেড়দিন জেল খাটতে হয়েছিল। বালুরঘাট আদালতে হাকিমের এজলাসে সরকার পক্ষের উকিল তাঁর কাছে জানতে চান— 'কোথায় হয়েছে পুলিশ মার্ডার'? এই প্রশ্ন শুনে তিনি নির্বিকারভাবে নিজের আঙুল মাথায় ঠেকিয়ে বলেন— 'আমার মস্তিষ্কে। তবে এখনও কোথাও হয়নি, একদিন হামেশাই হবে।' বিচার শেষে হাকিমের নির্দেশে ছত্রিশ ঘন্টা জেল হাজতে কাটাতে হয়েছিল মাধাই মহন্তকে।[২০]

মিনতি সোরীর ঘটনা বাস্তবে সত্যিই ঘটেছিল— সেই সত্য ঘটনা অবলম্বনে তিনি পুলিশ মার্ডারের ঘটনাটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে ঘটনা পরম্পরায় পালার মধ্যে জুড়ে দিয়েছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই পালাটি অভিনীত হওয়ার বেশ কিছুদিন পর পুলিশ মার্ডারের ঘটনা ঘটে। একজন শিল্পী দূরদর্শী না হলে কি শিল্পের কল্পনা বাস্তবে মিলে যেতে পারে? প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, *মিনতি সোরী পুলিশ মার্ডার* খনপালাটি পরবর্তীকালে অনেক খনশিল্পী বহু রজনী অভিনয় করেছেন।[২১] মাধাই মহন্তের এই *মিনতি সোরী পুলিশ মার্ডার* খনপালাটি ছিল কাল্পনিক খনপালার পূর্ব প্রস্তুতি কিংবা বলা যেতে পারে এটি ছিল তাঁর কাল্পনিক খনপালাগানের একটি খসড়া।

'কাল্পনিক খন' শাস্ত্রের কোনো বিষয় কিংবা সমাজে ঘটে যাওয়া প্রেম বা প্রেমের কেচ্ছা-কাহিনি নিয়ে গড়ে ওঠে না। তাহলে এই কাল্পনিক খনপালার বিষয়টা কী? সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার হয়, যখন তা মানুষের হাতে প্রথম আসে তখন সেটা নিয়ে মানুষের বিস্ময়ের সীমা থাকে না! সেই ধরনের বিষয়গুলিকে নিয়ে নারী-পুরুষের একটি কল্পিত কাহিনির মোড়কে বিষয়টির কার্যকারিতা, গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব খনপালার মধ্যে পরিবেশিত হয়। সেই ধরনের খনপালাগুলিকে মাধাই মহন্ত 'কাল্পনিক খন' হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।[২২] বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। প্রথম যখন মানুষের হাতে হ্যাজাক লাইট এলো তখন মানুষ বিস্মিত হয়েছিল। আর এই হ্যাজাক লাইটকে কল্পনা করে লেখা হয়েছিল *হ্যাজাক সোরী* খনপালা। আবার চাষের ক্ষেত্রে যখন পাম্প এলো, তখন এই পাম্পকে নিয়ে রচিত হয়েছিল *পাম্পিং সোরী* খন। একই ভাবে সাইকেলকে নিয়ে *সাইকেল সোরী*। ঘরে ঘরে যখন বিদ্যুতের আলো, তা নিয়ে মাধাই মহন্ত লিখেছিলেন *কারেন্ট সোরী*। এই ধরনের খনপালার ক্ষেত্রে শিল্পীর কল্পনাই হচ্ছে আসল চাবিকাঠি। সেই রকম এক 'কাল্পনিক খন'-এর চিন্তা করেছিলেন মাধাই মহন্ত, যার নাম ছিল *সিম চিপ সোরীর কথা*। তিনি কল্পনা করে এই খনপালায় যেভাবে যুক্তি পরম্পরায় ঘটনাগুলি সাজিয়ে ছিলেন

তা ভাবলে অবাক হতে হয়। মোবাইলের সিম ও চিপ যেন দুই নারী। দুই নারীর মধ্যে যেমন কথা চালাচালি হয় তেমনই সিম কথা চালাচালি করে, অন্য নারী চিপ গান শোনায়। মোবাইল সেটটি হল সিম আর চিপের স্বামী, আর মোবাইল সেটের মালিক হল নিঃসন্তান ক্রেতা— যে অন্যের সন্তানকে বুক পকেটে আগলে রাখে। কিন্তু মোবাইল সেট মালিকের কথায় চলে না, চলে অন্যের কথায় অর্থাৎ চার্জারের কথায়। আর এই চার্জার হল গ্রামের দেউনিয়া। এই ভাবে *সিম চিপ সোরীর কথা* খনপালার কাল্পনিক আখ্যানটি বুনেছিলেন মাধাই মহন্ত। সেই সময় আর একটি জনপ্রিয় এবং প্রচলিত খনপালা ছিল *মোবাইল সোরী টাওয়ার বাউদিয়া*— যা 'কাল্পনিক খন'-এর আর একটি যথার্থ উদাহরণ। আমরা তাই শাস্তোরী খন এবং অ-শাস্তোরী খনের পাশাপাশি নতুনভাবে যুক্ত করতে চাই 'কাল্পনিক খন'-কে।

ব্যক্তিজীবনে অনেক উত্থান পতন, অনেক বৈপরীত্য থাকা সত্ত্বেও মাধাই মহন্ত আদ্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুরের মাটিকে, মানুষকে, তাদের লোক-ঐতিহ্য ও বিচিত্র সংস্কৃতিকে ভালোবেসেছিলেন আ-মৃত্যু। পরিশেষে আমরা দেখার চেষ্টা করবো দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রথিতযশা প্রবীণ শিল্পী মাধাই মহন্তের 'কাল্পনিক খন' কোন্ কোন্ দিক থেকে ব্যতিক্রমী ও আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন? আমরা ক্রমান্বয়ে তা আলোচনা করবো।

প্রথমত, তিনি প্রথাগত পড়াশোনা না করে ব্যবহারিক শিক্ষা এবং জীবনাভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যকে সম্বল করে সারাজীবনে এককভাবে ছাপান্নটি (৫৬টি) খনপালা (শাস্তোরী, অ-শাস্তোরী এবং কাল্পনিক খন মিলিয়ে) মুখে মুখে তৈরি করেছিলেন— যেখানে লোকশিল্পীরা মূলত যৌথ ও মৌখিকভাবে খনপালা গড়ে তুলতেন। এদিক থেকে মাধাই মহন্তের প্রয়াস আধুনিকতার দাবি রাখে।

দ্বিতীয়ত, পড়াশোনা না জানলেও তিনি প্রাথমিকভাবে মা ও ঠাকুরদার কাছে শোনা লোকগান এবং পরবর্তীকালে বৃহত্তর দিনাজপুরের বিচিত্র লোকগানের (যথা— কীর্তনগান, পাঁচালী, কবিগান, তুক্ষ্যাগান, খনগান, বাউলগান, ভাটিয়ালি, বন্ধুয়ালা ইত্যাদি) রূপ ও রস প্রকৃতির খোলা আঙ্গিনায় হৃদয় ভরে আস্বাদন করেছিলেন। তাই তিনি খনপালাগানে নিজেই খনগানের প্রচলিত সুরের পাশাপাশি নতুন সুরারোপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন— সেদিকে থেকে মাধাই মহন্ত ব্যতিক্রমী, কেননা তিনিই প্রথম খনপালাগানের আধুনিক সুরকার।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিজীবনের নানা উত্থান-পতন থাকলেও মাধাই মহন্ত কখনও সরকারের তোষামদ করেননি কিংবা সরকারী প্রচারে নিজের খনপালাগানকে ব্যবহার করেননি, যদিও তিনি শেষ জীবনে সরকারের অনুদান ও সম্মাননা গ্রহণ করেছিলেন। এদিক থেকে মাধাই মহন্ত আদ্যোপান্ত আধুনিকমস্ক একজন ব্যতিক্রমী গণতান্ত্রিক খনশিল্পী — যিনি সরকারের ভুলকাজগুলির কঠোর সমালোচনা করতেও কোনোদিন পিছুপা হননি।

চতুর্থত, তিনি প্রচলিত খনপালার পথ ধরেই খনপালা রচনা করলেও শুধুমাত্র সমাজে সদ্য ঘটা কেচ্ছা কাহিনিতেই খনপালাকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং প্রাত্যহিক জীবনাভিজ্ঞতার সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেই ঘটনা ভবিষ্যৎ সমাজে কতখানি প্রভাবে ফেলতে পারে তার একটি সম্ভাবনাও খনপালায় প্রয়োগ করতে পারতেন— যার অন্যতম উদাহরণ *মিনতি সোরী পুলিশ মার্ডার* খনপালা। মিনতিসোরীর ঘটনাটা বাস্তবে ঘটেছিল, কিন্তু তার ফলে ভবিষ্যতে যে পুলিশ মার্ডার হতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন— পরবর্তীতে যা বাস্তবেও ঘটেছিল। খনশিল্পী হিসেবে মাধাই মহন্ত একাধারে যেমন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন, অন্যদিকে তেমনই আধুনিক।

পঞ্চমত, খনপালাগানের প্রচলিত সংরূপের বাইরে বেরিয়ে মাধাই মহন্তই প্রথম 'কাল্পনিক খন' নামক নতুন একটি খনপালার সংরূপের ধারণা দিয়েছিলেন। যেখানে শাস্ত্রের কোনো বিষয় বা সমাজে ঘটে যাওয়া প্রেমের কেচ্ছা-কাহিনি আলোচ্য নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার নতুন নতুন প্রযুক্তিই তার বিষয় হয়ে ওঠে। যে বিষয়গুলিকে নিয়ে নারী-পুরুষের একটি কল্পিত কাহিনির মোড়কে বিষয়টির কার্যকারিতা, গুরুত্ব এবং অভিনবত্ব খনপালার মধ্য দিয়ে পরিবেশিত হয়— তাকেই তিনি 'কাল্পনিক খন' বলেছিলেন। যেমন— *হ্যাজাক সোরী, কারেন্ট সোরী, সিম চিপ সোরীর কথা* ইত্যাদি। 'কাল্পনিক খন'-এর স্রষ্টা হিসেবে আধুনিকমস্ক মাধাই মহন্ত লোকনাট্যের আঙ্গিনায় যেমন ব্যতিক্রমী খনশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন, তেমনই তাঁর কাল্পনিক খনপালাগান হয়ে উঠেছিল আধুনিক।

তথ্যসূত্র :

১. *স্বাস্থ্য শিক্ষা উন্নয়ন*, অক্টোবর ২০১৮, পৃ. ১০ (দ্র. : পত্রিকায় সম্পাদকের নাম অনুল্লেখিত)
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০
৩. চন্দ সুনীল, 'লোকনাট্য খন ও শিল্পী মাধাই মহন্ত', *দাগ*, (সম্পা.) মনোনীতা চক্রবর্তী, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, উৎসব ১৪২০ ব., পৃ. ১৩২
[বি. দ্র. : পরবর্তী তথ্যসূত্রে পত্রিকাটি *দাগ*, তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, উৎসব ১৪২০ ব. উল্লেখিত হবে]
৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২
৫. আমাকে দেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে শান্তিবালা রায় (মাধাই মহন্তের প্রথম স্ত্রী) এই ঘটনাগুলি উল্লেখ করেছিলেন, ২০ মে ২০১৯
৬. আমাকে দেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে অরিন্দম সিংহ রাণা (বিশিষ্ট লোকসংগীতশিল্পী এবং মাধাই মহন্তের জীবনের শেষ পর্বের প্রিয় শিষ্য) এই ঘটনা জানিয়েছিলেন, ২০ মে ২০১৯
৭. পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার, ২০ মে ২০১৯
৮. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলার লোকসাহিত্য*, পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা. লি., ২০০৪, পৃ. ১৪৯
৯. ভৌমিক নির্মলেন্দু, 'জনযোগাযোগ : উত্তরবঙ্গের লোকনাটক', *নকশি কাঁথা*, ২০০৮, পৃ. ৩৩
১০. মজুমদার শিশির, 'খন্', *লোকনাট্য-নাটক-কথা*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মোম, ২০০৫, পৃ. ৯৫
১১. ঐ, 'দক্ষিণ দিনাজপুরের লোকনাট্যগীতি : খন গান', *নাট্যশালা শতবর্ষ স্মরণিকা*, পশ্চিম দিনাজপুর, ১৯৭৩, পৃ. ৮৬
১২. রায়, পুষ্পজিৎ, 'গ্রামীণ লোকনাটক : খন', *বাঙলা গ্রামীণ লোকনাটক*, (সম্পা.) শ্রীসনৎকুমার মিত্র, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ১৭৯
১৩. মজুমদার, শিশির, 'খন্', *লোকনাট্য-নাটক-কথা*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, মোম, ২০০৫, পৃ. ৯৫
১৪. রায়, পুষ্পজিৎ, 'লোকনাটক খনগান', *মুখোশের কথা ও অন্যান্য*, প্রথম প্রকাশ কলকাতা, শ্রীভারতী প্রেস, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ. ১৬৮
১৫. আমাকে দেওয়া ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে খগেন মণ্ডল (মাধাই মহন্তের শেষ জীবনের কাছের মানুষ) খন নিয়ে মাধাই মহন্তের এই ব্যতিক্রমী ভাবনার কথা জানিয়েছেন, ২০ মে ২০১৯
১৬. চন্দ, সুনীল, 'লোকনাট্য খন ও শিল্পী মাধাই মহন্ত', *দাগ*, তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, উৎসব ১৪২০ ব., পৃ. ১৩১
১৭. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে খগেন মণ্ডল এই ব্যতিক্রমী ভাবনার কথা জানিয়েছিলেন, ২০ মে ২০১৯
১৮. পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকার, ২০ মে ২০১৯
১৯. চন্দ, সুনীল, 'লোকনাট্য খন ও শিল্পী মাধাই মহন্ত', *দাগ*, তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, উৎসব ১৪২০ ব., পৃ. ১৩১
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২
২১. *মিনতি সোরী পুলিশ মার্ডার* খনটি আকুলবালা সরকার ও রমণীমোহন সরকার পরবর্তীতে অভিনয় করেছেন একাধিকবার। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে আকুলবালা সরকার একথা জানিয়েছেন, ৭ জুন ২০১৯
২২. চন্দ, সুনীল, 'লোকনাট্য খন ও শিল্পী মাধাই মহন্ত', *দাগ*, তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, উৎসব ১৪২০ ব., পৃ. ১৩২